ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1849-1855
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.408

শূন্যতা ও মধ্যমা প্রতিপদ: বৌদ্ধ দর্শনের পারমার্থিক বিবর্তনে আচার্য নাগার্জুনের অবদান

আব্দুল সামাদ সেখ, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Acharya Nagarjuna occupies a unique and monumental position in the history of Buddhist philosophy. His seminal contribution, the doctrine of Sunyata, serves to illuminate and deepen the foundational teachings of Gautama Buddha. This article aims to examine the profound interrelation between Nagarjuna's concept of Sunyata and the Buddha's Middle Way (Madhyama Pratipad). The analysis clarifies that Sunyata is not a state of nihilism or non-existence; rather, it signifies the absence of independent existence. Nagarjuna argues that no phenomenon in the world is autonomous, as every entity arises in dependence upon specific causes and conditions. This fundamental interdependence is defined as Sunyata or Nisvabhavata (the lack of intrinsic nature). What the Buddha identified as Pratityasamutpada (Dependent Origination) is, according to Nagarjuna, ultimately equivalent to Sunyata at the ultimate level of reality. Furthermore, the paper explores how Nagarjuna employed rigorous logic to demonstrate that objects possess no permanent essence and that motion or change cannot exist independently. It also highlights Nagarjuna's masterful refutation of the misconception that accepting Sunyata would invalidate the Four Noble Truths. Ultimately, the study concludes that Sunyata is not merely a complex theoretical construct, but also a profound practical method for dispelling mental delusions and conceptual fabrications. To truly grasp the essence of Buddhist teachings and to facilitate the path toward Nirvana, Nagarjuna's philosophical insights remain profoundly relevant in the contemporary era.

Keywords: Acharya Nagarjuna, Emptiness (Śūnyatā), Middle Way (Madhyamāpratipad), Dependent Origination (Pratītyasamutpāda), Non-essentialism / Lack of inherent nature (Niḥsvabhāvatā), Nirvana

বৌদ্ধ দর্শনের সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের ইতিহাসে আচার্য নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক দর্শন বৌদ্ধ চিন্তাধারাকে কেবল সমৃদ্ধই করেনি, বরং বুদ্ধের আদি শিক্ষাকে এক অনন্য পারমার্থিক উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো নাগার্জুনের দর্শনে শূন্যতা এবং বুদ্ধের মধ্যমা প্রতিপদের মধ্যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি তাত্ত্বিকভাবে অনুসন্ধান করা। বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যতা কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবন নয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর উপদেশে বারবার জগতের অনিত্যতা এবং অনাত্মা বা সারবস্তুহীনতার কথা বলেছিলেন। প্রাচীন পালি নিকায়গুলোতেও শূন্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে সেই আদি বীজকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও অকাট্য দার্শনিক বৃক্ষে রূপান্তর করার কৃতিত্ব আচার্য নাগার্জুনের। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে সর্বাস্তিবাদীগণ, জগতের মূল উপাদান বা ধর্মগুলোকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলে মনে করতে শুরু

করেছিলেন। নাগার্জুন তাঁর প্রখর যুক্তিবোধ এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই ধারণাকে পরম নিষ্ঠার সাথে প্রমাণ করেন যে জগতের কোনো কিছুই একক, নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করতে পারে না।

নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্বের প্রাণভোমরা হলো বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা নির্ভরশীল উৎপত্তির তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে যেকোনো কিছুর উৎপত্তি বা অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে অন্য কোনো কারণ বা শর্তের ওপর নির্ভর করে। নাগার্জুন এই পরনির্ভরশীলতাকেই শূন্যতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি হলো যেহেতু প্রতিটি বস্তু বা ধারণা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে আছে সেহেতু সেই বস্তুটির নিজস্ব কোনো স্বভাব বা স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা থাকতে পারে না। যাকে আমরা সাধারণত বস্তুর অস্তিত্ব বলে মনে করি, তা আসলে কতগুলো হেতু ও প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র। এই নিঃস্বভাবতা বা নিজস্ব স্থায়ী সত্তার অভাবকেই তিনি পারিভাষিক অর্থে শূন্যতা বলেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নাগার্জুনীয় শূন্যতা কোনোভাবেই নাস্তিত্ববাদ বা Nihilism নয়। এটি মূলত একটি মহান মধ্যপথ বা মধ্যমা প্রতিপদ, যা অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই দুই চরম বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। বস্তু একেবারে নেই বা অলীক এটি যেমন পরম সত্য নয়, তেমনি বস্তুর একটি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত রূপ আছে এটিও সত্য নয়। এই দুই প্রান্তিক ধারণার ভারসাম্যই হলো শূন্যতা, যা বুদ্ধের মূল দর্শনের পারমার্থিক নির্যাস।

নাগার্জুন যখন এই শূন্যতাতত্ত্ব প্রচার করেন, তখন সমকালীন অনেক রক্ষণশীল পণ্ডিতই একে বৌদ্ধ ধর্মের মূল স্তম্ভগুলোর বিরোধী বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের প্রধান আশঙ্কা ছিল যে, যদি সবকিছুই শূন্য বা নিঃস্বভাব হয়, তবে বুদ্ধের দেওয়া চতুরার্য সত্য, কর্মফল, নির্বাণ কিংবা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের মতো মৌলিক ধারণাগুলোও অর্থহীন হয়ে পড়বে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই নাগার্জুনের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাগুলোকে গভীর মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাগার্জুন অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের শিক্ষাকে অস্বীকার তো করেই না, বরং তাকে পরম সত্যের আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যদি বস্তুসমূহ শূন্য না হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অপরিবর্তনীয় হতো, তবে জগতের কোনো বিবর্তন, আধ্যাত্মিক উত্তরণ বা মুক্তি সম্ভব হতো না। তাঁর দর্শনে শূন্যতা কোনো নিছক শুষ্ক তাত্ত্বিক কূটতর্ক নয়, বরং এটি মানুষের মনের ভ্রান্ত ধারণা বা প্রপঞ্চ দূর করার একটি মহৌষধ। মানুষ যখন মোহবশত বস্তুকে স্থায়ী মনে করে তখনই সে দুঃখের জালে আবদ্ধ হয়। আর যখন সে বস্তুর শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে সেই মোহ এবং আসক্তি থেকে চিরতরে মুক্তি পায়। এই মুক্তিই হলো বৌদ্ধ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা নির্বাণ।

নাগার্জুনের তাঁর অনন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা 'চতুষ্কোটির' প্রয়োগ ঘটিয়ে লৌকিক সংবৃত্তি এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব কীভাবে বুদ্ধের মধ্যপথের এক শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক রূপায়ণ সেই মূল সুরটি এখানে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নাগার্জুন তাঁর দর্শনে বারবার সতর্ক করেছেন যে, শূন্যতাকে যেন কেউ ভুলভাবে না বোঝে। তিনি একে তুলনা করেছেন বিষধর সাপের সাথে। ভুলভাবে ধরলে যেমন সাপ ধ্বংসের কারণ হয় তেমনি শূন্যতাকে নাস্তিত্ব মনে করলে তা সাধকের পতন ঘটাতে পারে। শূন্যতাকে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ বা দৃষ্টি হিসেবে না দেখে, বরং সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে চিত্তের মুক্তির একটি অপরিহার্য উপায় হিসেবে দেখাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। আচার্য নাগার্জুনের এই প্রজ্ঞা কেবল তাঁর সমকালেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধানেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও অনস্বীকার্য। বুদ্ধের অমিয় বাণীর এই পারমার্থিক বিবর্তন ও দার্শনিক সার্থকতা অনুধাবন করাই বর্তমান নিবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নিঃস্বভাবতার আলোকে শূন্যতাতত্ত্ব:

বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় শূন্যতা এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূরক। আচার্য নাগার্জুন তাঁর *মূলমধ্যমককারিকায়* অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যা প্রতীত্যসমুৎপাদ বা নির্ভরশীল উৎপত্তি, তাই হল শূন্যতা।[১] এই তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, জগতের প্রতিটি বস্তু বা ধর্ম অন্য কোনো কারণ বা হেতুর ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয়। এই পরনির্ভরশীলতাই প্রমাণ করে যে, বস্তুর নিজের কোনো স্বাধীন বা নিরপেক্ষ সত্তা নেই। দর্শনের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'নিঃস্বভাবতা'। অর্থাৎ বস্তুর এমন কোনো স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নেই যা অন্য কিছুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে টিকে থাকতে পারে। নাগার্জুন তাঁর যুক্তির ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের সাধারণ বোধ বা স্বভাবের ধারণাকে। আমরা সাধারণত মনে করি বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ বা স্বভাব আছে। কিন্তু নাগার্জুন দেখিয়েছেন, যদি কোনো বস্তুর নিজস্ব স্বভাব থাকতো তবে সেই বস্তুটির কোনো পরিবর্তন সম্ভব হতো না। স্বভাব মানেই হলো যা অপরিবর্তনীয় এবং যা অন্যের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন কথা বলে। এখানে প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনশীল এবং বিনাশী। এই পরিবর্তনের ধারণাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাগার্জুন অত্যন্ত চমৎকার কিছু যুক্তি পেশ করেছেন।

প্রথমেই আসা যাক গতি বা পরিবর্তনের যুক্তিতে। নাগার্জুন প্রশ্ন তুলেছেন একটি বস্তু যখন পরিবর্তিত হয় তখন সেই পরিবর্তনটি ঠিক কোথায় ঘটে? ধরা যাক একজন যুবক সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধে পরিণত হন। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'বৃদ্ধ' হওয়ার প্রক্রিয়াটি কি যুবকের মধ্যে ঘটছে, নাকি অন্য কোথাও? যদি আমরা বলি যুবকই বৃদ্ধ হন, তবে একটি যৌক্তিক অসংগতি দেখা দেয়। যুবক এবং বৃদ্ধ এই দুটি দশা সম্পূর্ণ বিপরীত। যে মুহূর্তে তিনি যুবক, সেই মুহূর্তে তিনি বৃদ্ধ নন। আবার যখন তিনি বৃদ্ধ তখন তিনি আর যুবক নন। ফলে যুবক নিজে কখনোই বৃদ্ধ হতে পারে না, কারণ বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তার যুবক সত্তাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার যুবক ছাড়া অন্য কেউ বৃদ্ধ হচ্ছে একথা বলাও অসম্ভব। অর্থাৎ, যুবক এবং বৃদ্ধের মধ্যে কোনো স্থায়ী যোগসূত্র বা স্বভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা একে অপরের ওপর নির্ভর করে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয় মাত্র। অনুরূপভাবে, ক্ষীর বা দুধ থেকে দধির উৎপত্তির উদাহরণটি এখানে প্রাসঙ্গিক। যদি দুধের নিজস্ব কোনো স্থায়ী স্বভাব থাকতো তবে তা কখনোই দধিতে রূপান্তরিত হতে পারতো না। কারণ স্বভাব মানেই হলো অপরিবর্তনীয়তা। যদি দুধ নিজের স্বভাব বজায় রাখে তবে সে চিরকাল দুধই থেকে যাবে। আর যদি সে নিজের স্বভাব ত্যাগ করে দধি হয় তবে বোঝা যাচ্ছে যে তার কোনো স্থায়ী স্বভাব ছিল না। সুতরাং দুধ বা দধি কারোরই নিজস্ব কোনো পরম সত্তা নেই; তারা কেবল নির্দিষ্ট কারণ ও শর্তের (হেতু ও প্রত্যয়) সমষ্টি। এই যে বস্তুর নিজস্ব কোনো স্থায়ী রূপ না থাকা, একেই নাগার্জুন 'নিঃস্বভাবতা' বলেছেন।[২]

নাগার্জুন এই আলোচনাকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়েছেন সংস্কৃত ধর্মের লক্ষণগুলোর বিচার করার মাধ্যমে। বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখা মনে করত যে উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ এই তিনটি হলো জগতের সবকিছুর সাধারণ লক্ষণ। নাগার্জুন প্রশ্ন তুললেন, এই তিনটি লক্ষণ কি স্বতন্ত্রভাবে সত্য? যদি উৎপত্তি একটি স্বতন্ত্র ধর্ম হয়, তবে তার নিজেরও তো উৎপত্তি হওয়া প্রয়োজন। আর যদি উৎপত্তির জন্য অন্য কোনো উৎপত্তির প্রয়োজন হয়, তবে এক 'অনবস্থা' দোষ তৈরি হবে অর্থাৎ যুক্তির কোনো শেষ থাকবে না।[৩] তিনি প্রমাণ করলেন যে, যা উৎপন্ন হয়েছে তার নতুন করে উৎপত্তি সম্ভব নয়, আবার যা অনুৎপন্ন তারও উৎপত্তি হচ্ছে বলা যায় না। ফলে উৎপত্তি, স্থিতি বা বিনাশ এগুলো কোনো স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য নয়। এগুলো কেবল লোকব্যবহার বা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে ব্যবহৃত কতগুলো ধারণা মাত্র।

নাগার্জুনের এই নিঃস্বভাবতার তত্ত্ব আসলে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদকে এক অনন্য উচ্চতা দান করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের প্রকৃত অর্থই হলো শূন্যতা। প্রতীত্যসমুৎপাদ মানে অন্যের ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হওয়া, আর শূন্যতা মানে নিজস্ব স্বভাব না থাকা। অন্যের ওপর নির্ভর করা মানেই হলো নিজের মধ্যে খামতি থাকা বা রিক্ততা। তাই অভাব বা নাস্তিত্ব দিয়ে শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করা ভুল। অভাব মানে হলো 'কিছুই না', কিন্তু নাগার্জুনের শূন্যতা হলো 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা'। তিনি রথের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন। একটি রথ বলতে আমরা যা বুঝি, তা আসলে তার চাকা, অক্ষ, আসন এবং অন্যান্য অংশের একটি বিন্যাস মাত্র। এই অংশগুলোকে সরিয়ে নিলে 'রথ' বলে স্বতন্ত্র কোনো বস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার অংশগুলোও রথ ছাড়া অর্থহীন। অর্থাৎ রথ সত্তাটি তার অংশগুলোর ওপর নির্ভরশীল এবং অংশগুলোও সমগ্রের ওপর নির্ভরশীল। এই যে একে অপরের ওপর নির্ভর করে একটি ধারণার সৃষ্টি হওয়া, একেই নাগার্জুন 'উপাদায় প্রজ্ঞপ্তি' বলেছেন।[৪]

নাগার্জুন তাঁর *শূন্যতাসপ্ততি* গ্রন্থে আরও সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যারা মনে করেন ভাবপদার্থ বা বস্তুসমূহ শূন্য নয়, তাদের প্রধান যুক্তি হলো সংখ্যার অস্তিত্ব। প্রতিপক্ষ বলে থাকেন যে, যেহেতু আমরা 'এক', 'দুই' বা 'বহু' এই ধরণের সংখ্যা ব্যবহার করি, তাই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। নাগার্জুন এর উত্তরে বলেছেন, সংখ্যা নিজেই একটি প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধারণা।[৫] 'এক' না থাকলে 'অনেক' এর ধারণা জন্মায় না, আবার 'অনেক' না থাকলে 'এক' এর কোনো অর্থ থাকে না। সুতরাং সংখ্যার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে সবকিছুই আপেক্ষিক এবং নিঃস্বভাব। নাগার্জুন যখন বলেন "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে"[৬], তখন তিনি আসলে বৌদ্ধ দর্শনের এক পরম সত্যকেই উদ্ভাসিত করেন। তাঁর মতে শূন্যতাই হলো জগতের গতিশীলতার আধার। যদি সবকিছু 'অশূন্য' বা নিজস্ব স্বভাবে স্থির হতো তবে জগতের কোনো পরিবর্তন সম্ভব হতো না, কোনো সাধনা সফল হতো না এবং দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণও অসম্ভব হয়ে পড়ত। কারণ যা স্বভাবত সৎ তার বিনাশ নেই আর যা স্বভাবত অসৎ তার উৎপত্তি নেই। একমাত্র 'শূন্যতা' বা নিঃস্বভাবতা আছে বলেই জগত সচল এবং নির্বাণ সম্ভব। এই পরম উপলব্ধিই নাগার্জুনের দর্শনকে বৌদ্ধ পারমার্থিক বিবর্তনের এক শ্রেষ্ঠ ধাপে পরিণত করেছে। শূন্যতা এখানে কেবল একটি শব্দ নয়, বরং এটিই হলো জগতের প্রকৃত স্বরূপ এবং বন্ধনমুক্তির মূল চাবিকাঠি।

চতুরার্য সত্যের পারমার্থিক ভিত্তি ও নির্বাণ উপলব্ধিতে শূন্যতার ভূমিকা:

নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব যখন তৎকালীন বৌদ্ধ দার্শনিক মহলে প্রচারিত হতে শুরু করে, তখন তা এক প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে স্থবিরবাদী বা সর্বাস্তিবাদী দার্শনিকরা মনে করেছিলেন যে, যদি জগতের সবকিছুই 'শূন্য' বা 'নিঃস্বভাব' হয় তবে বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলোই ভেঙে পড়বে। নাগার্জুনের *মূলমধ্যমককারিকার* চব্বিশতম অধ্যায়ে এই বিতর্কের এক চমৎকার প্রতিফলন পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের প্রধান অভিযোগ ছিল যদি সবকিছুই শূন্য হয়, তবে বুদ্ধের দেওয়া 'চতুরার্য সত্য' (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং নিরোধের পথ) অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ যদি দুঃখের নিজস্ব কোনো স্বভাব না থাকে তবে সেই দুঃখের কারণ বা বিনাশেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের 'ত্রিরত্ন' (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) এবং আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো মূল্যই অবশিষ্ট থাকে না। আচার্য নাগার্জুন এই গুরুতোর অভিযোগের যে উত্তর দিয়েছেন, তা বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মোড়। তিনি এর উত্তরে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যারা শূন্যতাকে 'নাস্তিত্ব' বা 'অভাব' মনে করে ভয় পাচ্ছেন, তারা আসলে শূন্যতার প্রকৃত অর্থই বোঝেননি। নাগার্জুনের মতে, শূন্যতা চতুরার্য সত্যকে অস্বীকার করে না, বরং শূন্যতা আছে বলেই চতুরার্য সত্য সম্ভব হয়। তাঁর বিখ্যাত যুক্তি হলো যদি বস্তুসমূহ শূন্য না হয়ে 'অশূন্য' বা নিজস্ব স্বভাবে স্থির হতো, তবে জগতের কোনো পরিবর্তনই সম্ভব হতো

না। দুঃখ যদি স্বভাবত 'সৎ' হতো, তবে তা চিরকাল দুঃখই থেকে যেত, তাকে দূর করা যেত না। আবার দুঃখ যদি স্বভাবত 'অসৎ' হতো, তবে তার উৎপত্তিই হতো না। সুতরাং, জগতের সবকিছু নিঃস্বভাব বা শূন্য বলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারে।[৭]

শূন্যতা তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নির্বাণের ধারণা। নাগার্জুন নির্বাণকে কোনো ভৌগোলিক স্থান বা জগতের বাইরের কোনো বিষয় হিসেবে দেখেননি। তাঁর দর্শনে নির্বাণ হলো এক বিশেষ প্রকার উপলব্ধি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের দুঃখের মূলে রয়েছে কর্ম এবং ক্লেশ। এই কর্মক্লেশ উৎপন্ন হয় আমাদের মনের 'বিকল্প' বা ভ্রান্ত কল্পনা থেকে। আমরা যখন জগতকে দেখি, তখন আমাদের মন নানা প্রকার শব্দ, নাম এবং ধারণার বিস্তার ঘটায়, যাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় 'প্রপঞ্চ'। আমরা বস্তুকে স্থায়ী মনে করে 'আমি' এবং 'আমার' এই বোধে আচ্ছন্ন হই। নাগার্জুন দেখিয়েছেন যে, যখন একজন সাধক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ 'শূন্যতা' উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর মনের এই সমস্ত প্রপঞ্চ বা মিথ্যা ধারণার বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। চন্দ্রকীর্তি তাঁর *প্রসন্নপদা* টীকায় এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষের মনের বিকল্পগুলো অনাদি কাল থেকে চলে আসা নানা সংস্কারের ফল। মানুষ যখন শূন্যতা বা নিঃস্বভাবতা উপলব্ধি করে, তখন তার 'সৎকায়দৃষ্টি' বা নিজেকে একটি স্থায়ী সত্তা মনে করার ভ্রমটি দূর হয়। এই ভ্রম দূর হওয়ার সাথে সাথেই আসক্তি ও দ্বেষ স্তিমিত হয়ে আসে এবং নতুন করে কোনো কর্ম সম্পাদিত হয় না। কর্মের অভাবে নতুন জন্ম বা সংসারচক্রের অবসান ঘটে। এই যে সমস্ত প্রকার বিকল্প ও প্রপঞ্চের অবসান ঘটা, একেই নাগার্জুন 'নির্বাণ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়- "প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ"[৮] অর্থাৎ সব ধরণের মানসিক বিস্তারের শান্ত হওয়াই হলো পরম কল্যাণ বা নির্বাণ। নাগার্জুন বলেছেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'সংসার' এবং 'নির্বাণ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা যখন জগতকে অবিদ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে দেখি, তখন তা 'সংসার' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আবার যখন সেই জগতকেই প্রজ্ঞা বা শূন্যতার দৃষ্টিতে দেখি, তখনই তা 'নির্বাণ'। অর্থাৎ, নির্বাণ কোনো নতুন প্রাপ্তি নয়, বরং জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। এই উপলব্ধির মাধ্যমেই নাগার্জুন বৌদ্ধ দর্শনের সেই মহান লক্ষ্যকে সার্থক করেছেন, যেখানে আধ্যাত্মিকতা এবং যুক্তিবাদ একীভূত হয়েছে।[৯]

প্রতিপক্ষের আরেকটি বড় সংশয় ছিল বুদ্ধের উপদেশ নিয়ে। বুদ্ধ যদি জানতেন সবকিছু শূন্য, তবে তিনি কেন স্কন্ধ, ধাতু বা আয়তনের মতো নানাত্বের উপদেশ দিলেন? নাগার্জুন এর উত্তরে বুদ্ধের 'অভিপ্রায়িক দেশনা' বা উপদেশের বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, বুদ্ধের দেশনা মূলত দুই প্রকার সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি হলো 'সংবৃত্তি সত্য' বা লোকব্যবহারিক সত্য, এবং অন্যটি হলো 'পরমার্থ সত্য'। সাধারণ মানুষকে ধর্মের পথে চালিত করার জন্য বুদ্ধ সংবৃত্তি বা লৌকিক সত্যের আশ্রয় নিয়ে নানা উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পরমার্থ সত্য বা শূন্যতার বোধ জাগিয়ে তোলা। যারা সংবৃত্তি সত্যকে না জেনে সরাসরি পরমার্থ সত্য বুঝতে চায়, তারা যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি যারা কেবল সংবৃত্তি সত্যেই আটকে থাকে, তারা নির্বাণ লাভ করতে পারে না।[১০]

নাগার্জুন প্রমাণ করেছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের শিক্ষার কোনো ক্ষতি করে না। বরং যারা শূন্যতাকে অস্বীকার করে, তারাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত কাঠামোকে নষ্ট করে। কারণ যদি সবকিছুকে 'অশূন্য' বা স্থায়ী মনে করা হয়, তবে বুদ্ধের 'অনিত্যবাদ' মিথ্যা হয়ে যায়, 'অনাত্মবাদ' অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মানুষের মুক্তির সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নাগার্জুনের দর্শনে শূন্যতা তাই কেবল একটি শব্দ নয়, এটি হলো এক পরম 'চিকিৎসা'। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শূন্যতা যেন আবার কোনো নতুন 'মতবাদ' হিসেবে আঁকড়ে ধরা না হয়। যারা শূন্যতাকে একটি স্থায়ী মতবাদ (View) হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা সেই রোগীর মতো যাকে ওষুধ

দেওয়া হয়েছিল রোগ সারানোর জন্য, কিন্তু সে সেই ওষুধটিকেই নিজের রোগ বানিয়ে ফেলেছে।[১১] সুতরাং, সমস্ত মতবাদ ও প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত হয়ে জগতের নিঃস্বভাবতাকে অনুভব করাই হলো নাগার্জুনীয় দর্শনের সার্থকতা এবং নির্বাণের প্রকৃত রূপ।

উপসংহার:

আচার্য নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব কেবল বৌদ্ধ দর্শনের একটি শাখা নয়, বরং এটি মানব চিন্তার ইতিহাসে এক অনন্য বিপ্লব। এই প্রবন্ধে আমরা দেখেছি কীভাবে নাগার্জুন বুদ্ধের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' এবং 'মধ্যমা প্রতিপদকে' এক অকাট্য যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর দর্শনের মূল সুরটি হলো জগতের কোনো কিছুই পরম বা স্বতন্ত্র নয়; সবকিছুই আপেক্ষিক এবং শর্তসাপেক্ষ। এই আপেক্ষিকতাই হলো বস্তুর 'শূন্যতা'। নাগার্জুনের এই শূন্যের ধারণাটি আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে আজও গভীর কৌতূহলের জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে ভারততত্ত্ববিদ ও দার্শনিক অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের একটি বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নাগার্জুনের দার্শনিক শূন্যতাকে গণিতের 'শূন্য' (Zero) এর সাথে তুলনা করেছেন। আমরা জানি যে, গণিতের শূন্যের নিজস্ব কোনো একক মান নেই, কিন্তু যখন তা অন্য কোনো সংখ্যার পাশে বসে (যেমন ১ এর পাশে ০ বসে ১০ হয়), তখন তার একটি 'স্থানিক মান' বা 'Place Value' তৈরি হয়। অর্থাৎ, গণিতের শূন্য যেমন স্বতন্ত্রভাবে মানহীন কিন্তু অন্য সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নাগার্জুনের শূন্যতাও ঠিক তেমনই। জগতের কোনো ভাবপদার্থের নিজস্ব কোনো স্থায়ী সত্তা বা 'স্বভাব' নেই, কিন্তু তারা যখন একে অপরের ওপর নির্ভর করে (প্রতীত্যসমুৎপন্ন হয়), তখন আমাদের লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের একটি কার্যকরী রূপ তৈরি হয়। এই যে নিজের শূন্যতাকে স্বীকার করেও অন্যের সাপেক্ষে অস্তিত্বশীল হওয়া, এটাই নাগার্জুনীয় শূন্যতার আসল সৌন্দর্য। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, নাগার্জুন শূন্যতাকে কোনো 'অভাব' বা 'নাস্তিত্ব' হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে শূন্যতা হলো এক প্রকার মুক্তি। মানুষ যখন মনে করে বস্তু স্থায়ী বা শাশ্বত তখনই সে সেই বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় এবং দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু শূন্যতার বোধ মানুষকে শেখায় যে জগত পরিবর্তনশীল এবং কোনো কিছুরই স্থায়ী মালিকানা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিই মানুষের মনের 'প্রপঞ্চ' বা ভ্রান্ত কল্পনার জাল ছিঁড়ে দেয়। নাগার্জুন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের চতুরার্য সত্য বা নির্বাণকে অস্বীকার করে না, বরং শূন্যতা আছে বলেই আধ্যাত্মিক সাধনা এবং পরম শান্তি লাভ সম্ভব হয়। পরিশেষে বলা যায়, নাগার্জুন যখন বলেন যে সব কিছুই 'শূন্য' তখন তিনি আমাদের জগতত্যাগী হতে বলেন না, বরং জগতকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে শেখান। তাঁর দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে শূন্যতা কোনো নতুন 'মতবাদ' নয়। যারা শূন্যতাকে আবার একটি নতুন দর্শন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চায়, নাগার্জুন তাদের 'অসাধ্য' বা 'অপ্রতিকার্য' রোগী বলে অভিহিত করেছেন। কারণ শূন্যতার লক্ষ্য হলো মানুষকে সব ধরণের মতবাদ ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা। বর্তমান আধুনিক সময়েও, যেখানে ভোগবাদ এবং স্থায়ীত্বের মোহ মানুষকে অস্থির করে তুলছে, সেখানে নাগার্জুনের এই 'নিঃস্বভাবতা' বা শূন্যতার শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধের আদি শিক্ষার এই পারমার্থিক বিবর্তনটি নাগার্জুনের লেখনীতে যে পূর্ণতা পেয়েছে, তা আজও মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

১. "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।
সা প্রজ্ঞপ্তিরুপাদায় প্রতিপৎ সৈব মধ্যমা।।"- নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ২৪.১৮।
২. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য। সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ১০৫।

৩. নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ৭.১৯।
৪. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ২২০।
৫. নাগার্জুন। শূন্যতাসপ্ততি। কারিকা- ৭।
৬. নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ২৪.১৮।
৭. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ২১০।
৮. তদেব, পৃ. ১৫০।
৯. গারফিল্ড, জে. এল. দ্য ফান্ডামেন্টাল উইজডম অফ দ্য মিডল ওয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, অক্সফোর্ড, পৃ. ৩৩১।
১০. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, সম্পা. জনার্দন গানেরি। মাইন্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড: দ্য কালেক্টেড এসেস অফ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, দিল্লি, পৃ. ২০৯-২১২।
১১. "শূন্যতা সর্বদৃষ্টিনাং প্রোক্তা নিঃসরনং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতাদৃষ্টিস্তানসাধ্যান বভাষিরে।।"- নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ১৩.৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আম্বেদকর, ভীমরাও রামজি। দ্য বুদ্ধ অ্যান্ড হিজ ধম্ম। সিদ্ধার্থ কলেজ পাবলিকেশন, ১৯৫৭, মুম্বাই।
২. গারফিল্ড, জে. এল। দ্য ফান্ডামেন্টাল উইজডম অফ দ্য মিডল ওয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, অক্সফোর্ড,।
৩. ঘোষ, বটকৃষ্ণ, সম্পা. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানবাদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৪, কলকাতা।
৪. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। । প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা।
৫. চৌধুরী, সুকোমল। বৌদ্ধদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫, কলকাতা ।
৬. দত্ত, সুকুমার। বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৫, কলকাতা ।
৭. নাগসেন, অনু. ধরমধর ভান্তে। মিলিন্দপঞ্হ। মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৯০, কলকাতা।
৮. বড়ুয়া, বেণীমাধব। বৌদ্ধ দর্শন। সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৭৮, কলকাতা।
৯. বোধি, ভিক্ষু। দ্য কানেক্টেড ডিসকোর্সেস অফ দ্য বুদ্ধ। উইজডম পাবলিকেশন, ২০০০, বোস্টন।
১০. ভট্টাচার্য, কালিদাস। বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮২, কলকাতা।
১১. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, সম্পা. জনার্দন গানেরি। মাইন্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড: দ্য কালেক্টেড এসেস অফ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, দিল্লি।
১২. রাহুল, ওয়ালপোলা। হোয়াট দ্য বুদ্ধ টট। গ্রোভ প্রেস, ১৯৫৯, নিউ ইয়র্ক।
১৩. রাধাকৃষ্ণান, এস। ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, ১ম খণ্ড। জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯২৩, লন্ডন।
১৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৫, কলকাতা।
১৫. হিরিয়ানা, এম। আউটলাইনস অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি। জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৩২, লন্ডন।